বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক : পলাশী থেকে ধানমন্ডি

ভজন সরকার

পলাশী থেকে ধানমন্ডি নাটক খানি দেখলাম - দু'সপ্তাহের অখন্ড অবসরে । নাটকটির কাহিনী ,পরিচালনা আর চিত্রনাট্য আবদুল গাফফার চৌধুরীর । জনাব গাফফার চৌধুরী গুনী মানুষ । একুশের সেই কালজয়ী ,'' আমার ভাইয়ের রক্তে রাংগানো একুশে ফেব্রুয়ারী ,আমি কি ভুলিতে পারি '' গানের গীতিকার । এই একটি গানের জন্যেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন ; আর কিছু না করলেও । এ প্রসংগে সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায়ের একটি কথা মনে পড়লো । তাঁর সারাজীবনের একটি বাসনা ছিলো ,অন্তত একটি কবিতার লাইনও যদি মানুষের মুখে মুখে থাকে তবেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতা । যখন অন্নদাশংকরের দেশ বিভাগ নিয়ে লেখা ছড়া ,''তেলের শিশি ভাঙ্গলো বলে খুকীর উপর রাগ করো, তোমরা তো সব বুড়ো খুকী দেশটা ভেঙ্গে ভাগ করো'' ব্যাপক প্রচার পেলো, তিনি তৃপ্তির ঢেকুর তুললেন এ ভেবে যে , তাঁর সাহিত্য সাধনা অবশেষে সার্থক হোলো । সেদিক থেকে আবদুল গাফফার চৌধুরী শুধু সফল নন , সফলতম মানুষ । কেননা, বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের মুখে তাঁর রচিত গানের কথা বাজে একুশের মাসে, একুশের প্রহরে তো বটেই ।

বাংলাদেশে অন্তত কয়েক হাজার লেখক-কবি কিংবা লেখক- কবি যশঃপ্রার্থী আছেন , যাঁদের একটি কবিতা কিংবা লেখার ছত্রও নিজেরা ছাড়া অন্য কেউ মনে রাখেন না কিংবা রাখেন নি । এক মাত্র একুশের বই মেলা উপলক্ষেই প্রতি বছর বাংলাদেশে হাজার দেড়েক লেখক -কবি বই ছাপান । এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় , ২০০৯ সালে একুশের মাসেই ১৬৮২ জন কবি-লেখক তাদের গাঁটের পয়সা খরচ করে বই প্রকাশ করেছেন । একমাত্র কানাডা প্রবাসীই কয়েক ডজন কবি-লেখক আছেন যাঁরা প্রতি বছর বই ছাপান কয়েকটি করে । বাংলাদেশে সাহিত্যের আলপথে হাঁটা বিদগ্ধদের কথা না হয় বাদই দিলাম । প্রতিভায় তাঁরা সবাই যে আবদুল গাফফার চৌধুরীর চেয়ে কম এ কথা নিশ্চিত করে বলা যাবে না । মহাকালের নিদারুন প্রহসনই এটা যে, কখন কার কপোলে সফলতার বিজয় তিলোক আঁকা হয়ে যায় কেউ তা জানে না । আর সেই আশা বুকে ধারণ করেই প্রত্যেক সৃষ্টিশীল মানুষই বোধ হয় বেঁচে থাকেন । যদিও দু'একজন ছাড়া আর কেউ নিজের জীবোদ্দশায় নিজের সৃষ্টি কর্মের এমন ব্যাপক প্লাবন দেখে যেতে পারেন না, সেদিক থেকেও আবদুল গাফফার চৌধুরী একজন পরম সৌভাগ্যবান মানুষ ।

এত সব গৌরচন্দ্রিকার পেছনের যে মোদ্দা কথা সেটা হোলো, নাটকটি দেখতে বসার আগেই মনের অনেক উঁচুতে একটা আকাশপ্রদীপ জ্বল জ্বল করছিলো । সেই গগনচুম্বী প্রদীপের সলতেটা নাটক শুরু হবার সাথে সাথেই যেনো নিভে গেলো এক পল্কা বাতাসের ঝাপ্টায় । দারুন আশাহত তো বটেই কিছুটা ক্ষোভ মিশ্রিত দুঃখও হোলো । মনে হোলো এটা তো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নাটক না, নাটকের নামে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে একটা নিম্ন মাঝারী মানের মফস্বলের কোন অজ্ঞাত-অখ্যাত ঘেঁটু ক্লাব থিয়েটারের প্রযোজনা। আর বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর আবদুল গাফফার চৌধুরী-ই কেন এই তৃতীয় শ্রেনীর প্রযোজনাটা করলেন অতি তড়িঘড়ি করে , সেটাই প্রশ্ন ? এতে কি বঙ্গবন্ধুকে প্রতিষ্ঠা করা গেছে কোন উচ্চতায় কিংবা বঙ্গবন্ধু হত্যাকারী সেই ঘাতক চক্রের মুখোশ করা গেছে উন্মোচিত ? বঙ্গবন্ধু হত্যার পর প্রায় তিন যুগ ধরে দেশী-বিদেশী চক্রের নানা প্রনোদনাতেও যখন বঙ্গবন্ধুর নাম বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলা যায় নি ,তখন এটা তো স্বতঃসিদ্ধ যে বঙ্গবন্ধু আর বাংলাদেশ -এ নাম দু'টি শুধু সমার্থক নয়, বাংগালীদের কাছে সমান ভালবাসা আর সমান আবেগেরও । তাই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নতুন করে নাটক লিখে নিজেকে প্রচার করা সম্ভব - বঙ্গবন্ধুকে নয় ।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের অব্যবহিত পরেই সংঘটিত জেল হত্যা সম্পর্কে সম্প্রতি এক লেখায় আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেছেন, ঘাতকদের পরিকল্পনা ছিলো শুধু মাত্র তাজউদ্দিন আহমেদকে হত্যা করার ;ঘটনাক্রমে অন্য তিন জাতীয় নেতাও নিহত হয়েছেন । আবদুল গাফফার চৌধুরীর এ রকম বিভ্রান্তকর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার উপস্থিতিতেই । সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম শুধু আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা নন, তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জেলখানায় নিহত জাতীয় চার নেতার অন্যতম নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলামের পুত্র ও । তিনি অভিযোগ করে বলেছেন যে, আবদুল গাফফার চৌধুরী তো সে সময় দেশেই ছিলেন না । তিনি কি করে সঠিক ইতিহাস জানবেন । পলাশী থেকে ধানমন্ডি নাটকটিতেও দেখা যায় সে রকম আরও অনেক তথ্য-বিচ্যুতি আর তত্ত্ব-তথ্যের অতিরঞ্জন । অনেক অপ্রয়োজনীয় চরিত্র আর বিষয়গুলোও এসেছে - যেটা নিছক আবদুল গাফফার চৌধুরীর চারপাশের মানুষগুলোকে তুলে ধরার একটা অশোভন আকাংখা ছাড়া আর কিছু নয় । তেমনি কিছু অপ্রয়োজনীয় চরিত্র আমিনূল হক বাদশা,কুলসুম ইত্যাদি । বঙ্গবন্ধুর মতো মানুষের জীবন নিয়ে কোন কিছু লেখার সময় এই সব নিম্নমানের স্বজনপ্রীতি আর ব্যক্তিগত টানাপোড়েনগুলো সামলাতে হয় , একজন ইতিহাসবেত্তার এই সহজ সত্য উপলব্ধিটুকুও আবদুল গাফফার চৌধুরী ভুলে গেছেন ।

কাহিনীর বিক্ষিপ্ত বিন্যাস,অত্যন্ত নিম্ন মানের সম্পাদনা ,তদুপরি অধিকাংশ অপেশাদার অভিনেতা- অভিনেত্রীদের উৎকট অভিনয়ে পলাশী থেকে ধানমন্ডি নাটকটিতে বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি করা হয়েছে এক নিদারুন প্রহসন । এতো কিছুও বাদ দেয়া যায় । কিন্তু নাটকটির নামকরণ নিয়ে যে এক চরম বিতর্কের সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা মেনে নেয়া যায় না কিছুতেই। জানি না, ন্যূনতম কোন সাযুজ্যে বঙ্গবন্ধুকে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সাথে তুলনা করা হয়েছে ? পলাশী প্রান্তরে এক পলায়নপর নবাবের হত্যার সাথে এক বুক সাহসকে প্রজ্জ্বলিত করে যে বজ্রকণ্ঠ সেদিন বীরের মতো নিজ বাড়ির সিঁড়িতে পরিবার পরিজন নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন সে কি সমার্থক ? মাত্র তেইশ বছরের এক অত্যাচারী , লম্পট, চরিত্রহীন ,মদ্যপ, আর নানা আলীবর্দী খাঁনের প্রশ্রয়ে বখে যাওয়া যুবক সিরাজ উদ্দৌলা আর জীবনের অধিকাংশ সময় বাংলার জন্য -বাংগালির জন্যে সংগ্রাম করে তিল তিল করে গড়ে ওঠা বাংলার সাধারণ মানুষের বন্ধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কি এক ? সিরাজ উদ্দৌলার যত বয়স বঙ্গবন্ধু তো জেলেই থেকেছেন প্রায় তার সমান । জানি না , কোন আবেগের বশবর্তী হয়ে আবদুল গাফফার চৌধুরী এই পর্বত প্রমান অসম তুলনার বিষয়টিকে নাটকের নামকরণে ব্যবহার করেছেন । ইতিহাসের ন্যূনতম নিরপেক্ষ কোন পাঠকের পক্ষেই এটা সম্ভব নয় । কেন নয়, সেটাই এখন আলোচনা করা যাক ।

প্রথমত, নবাব সিরাজ উদ্দৌলা এবং পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে লেখা ভূল ইতিহাস । পলাশীর যুদ্ধ আর নবাব সিরাজ উদ্দৌলা সম্পর্কে বাংলাদেশসহ ভারত বর্ষে যে কাহিনী পড়ানো হয়, তা মূলত ইংরেজ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ জনিত কারণে লিখিত এক পেশে মতবাদ । এতে আবেগ আছে, উচ্ছ্বাস আছে, আছে নাটকীয়তা সৃষ্টি করে জাতীয়তাবাদী চেতনা সৃষ্টির প্রয়াস । কিন্তু নিরপেক্ষতা চরম ভাবে অনুপস্থিত । আজ বাংলাদেশে পলাশীর যুদ্ধ বিষয়ক সমস্ত আবেগ মূলত আনোয়ার হোসেন- আনোয়ারা অভিনীত ‘ নবাব সিরাজ উদ্দৌলা ’’ যাত্রা পালা কিংবা চলচ্চিত্র থেকে উৎসরিত । ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্র-ই বোধ হয় প্রথম পলাশীর ইতিহাস লিখেন ঐতিহাসিক হিসেবে । তাঁর পলাশীর প্রান্তর গ্রন্থে যা বলেছেন সেটাও কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের রচনা বলা যাবে না কিছুতেই । কেননা, মূলত ইংরেজ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ থেকেই এসব লিখিত হয়েছে । এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য জানা যাবে এমন সমস্ত গ্রন্থের অন্যতম কয়েকটি গ্রন্থের লেখক যেমন গোলাম হোসেন সেলিম, গোলাম হুসেন টালবাবাদি । দু’জনেই পার্সী ভাষায় সিরাজ-উদ্দৌলার জীবনী লেখেন এবং যেখানে স্পষ্টতঃই সিরাজ উদ্দৌলাকে অত্যাচারী, লম্পট আর চরিত্রহীন বখে যাওয়া এক যুবক হিসেবে দেখানো হয়েছে ।

তা ছাড়া সিরাজ উদ্দৌলা তার বছরাধিক যে সময় (এপ্রিল ১৭৫৬ থেকে জুন ১৭৫৭) নবাবী করছেন সেটাও কোন হিসেবেই স্বর্ণ যুগ বলা যায় না । এর কিছু বর্ণনা আছে নিন্দিত- নন্দিত লেখক নিরোদ সি চৌধুরীর লেখা ,ক্লাইভ অব ইন্ডিয়া গ্রন্থে ।

দ্বিতীয়ত, নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতনকে যাঁরা বাংলার অস্তমিত সূর্যাস্ত বলে চিৎকার করেন তাদের অধিকাংশই না বুঝেই চিলে কান নিয়ে গেছে শুনে চিলের পেছনে ছুটেন আর কিছু সংখ্যক প্রবল ইংরেজ বিদ্বেষ থেকেই এটা বলেন । যদিও তাদের অধিকাংশই ইউরোপের খেয়ে-পড়েই জীবনাতিপাত করেছেন কিংবা করছেন। আবদুল গাফফার চৌধুরীসহ অধিকাংশরা এই শেষের দলভুক্ত । ইতিহাসের পাঠক মাত্রই স্বীকার করবেন, ১৭০৭ সনে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সব মোগল সম্রাটই ছিলেন স্বৈরাচারী আর লুটেরা । এমন কি সভ্যতা কৃষ্টি-সংস্কৃতি ধবংসকারীও । এর শেষ কাঠে পেরেক ঠুকেছেন আলীবর্দী খান, সিরাজ উদ্দৌলা এবং মীর জাফর । ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দু-মুসলমান অত্যাচারী জমিদার-নবাবদের সহায়তায় সাধারণ দরিদ্র প্রজাদের সর্বস্ব লুট করে এই মোগল সাম্রাজ্য টিকে ছিলো কোন ক্রমে জোড়াতালি দিয়ে । তাই তো রবীন্দ্রনাথ থেকে বঙ্কিম চন্দ্র, এমনকি রাজা রামমোহন রায় সহ কোন মনিষীরাই নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পতন নিয়ে কোন কিছুই লিখেন নাই । বরং ইংরেজ তথা ইউরোপীয় পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বাংগালী তথা প্রাচ্য সভ্যতার সাথে মিলিয়ে তৈরী করেছেন আমাদের বাংগালী জাতীয়তাবাদ আর ইতিহাস ঐতিহ্যের শক্ত ভিত ,আমাদের ভাষা-কৃষ্টি ,সংগীত, সাহিত্যের আধুনিকায়ন ।

তৃতীয়ত , আজকের আফগানিস্তান-পাকিস্তানের বাস্তবতা আমাদের তো চোখে আঙ্গুল দিয়েই দেখিয়ে দিচ্ছে মোগল সাম্রাজ্যের পতন না হোলে কোন অন্ধকার গুহাগর্ভে আমাদের সভ্যতা তলিয়ে যেতো অনেক দিন আগেই । যেমন মুছে গেছে আফগানিস্তান থেকে প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার চিহ্নগুলো । যেমন মুছে গেছে অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রগুলো পাকিস্তান থেকে । কোন কালেই তো ইংরেজরা শাসন করে নি আফগানিস্তান । তবুও কী আজকের আফগানিস্তানের জন্য দায়ী করবো ইংরেজদেরকেই ? আর এই পঞ্চাশ বছরেই পাকিস্তানের যে হাল ! আজকের পাকিস্তান কোন সভ্য মানুষের বসবাসের জায়গা নয় আর । হয়তো জন্মের পর থেকে পাকিস্তান ছিল অসভ্যদেরই আবাসস্থল ? আমাদের সৌভাগ্য বঙ্গবন্ধুর মতো এক মহান নেতার জন্ম হয়েছিলো এই গাংগেয় ব-দ্বীপে । তাই পাকিস্তানী হিসেবে পরিচিত হবার কলঙ্ক থেকে মুক্ত করেছেন বাংগালী জাতিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই । সে জন্যেই আমাদের সব অহংকারের জায়গা জুড়ে বঙ্গবন্ধুই আছেন এবং থাকবেন চিরকাল ।

সেই অহংকারের জায়গা নিয়েই অনেকে ব্যবসা বানিজ্যের ফন্দি-ফিকির খোঁজেন । পলাশীর অত্যাচারী নবাব সিরাজের সাথে বঙ্গবন্ধুর তুলনা করে আবদুল গাফফার চৌধুরীর এই নিম্ন মানের প্রযোজনা পলাশী থেকে ধানমন্ডি নাটক কি সে বানিজ্যেরই অংশ ? তা না হোলে, সে খেলা এখনো কেনো থেমে নেই ? এবার নাটকের পর প্রচেষ্টা চলছে চলচিত্র নির্মানের । কখনো অমিতাভ বচ্চন, কখনো গৌতম ঘোষ, কখনো ঐশ্বরিয়া রাই কিংবা অভিষেক বচ্চন । বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এ যেনো এক বাহারী বিজ্ঞাপনের রঙ্গীন পোস্টার । যাদের প্রডাকশন থেকে একটি ডক্যুমেন্টারিও বের হয় নি কোন দিন, সেই ব্যানারেই নাকি বের হবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলচিত্র ? জানি না , বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার সম্মতি আছে কিনা এতে ? কিন্তু এটা তো ভুললে চলবে না, বঙ্গবন্ধু বাংগালী জাতিস্বত্তার এক অমূল্য সম্পদ । বঙ্গবন্ধু বাংগালী জাতীয়তাবাদের এক সুদৃঢ় ভিত্তি ভূমি । আবদুল গাফফার চৌধুরী কেনো ,শেখ হাসিনা কিংবা শেখ রেহানারও একক সম্পত্তি নন বঙ্গবন্ধু আজ।

।। ১৪ নভেম্বর, ২০০৯ ।।